OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 353 - 364
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখন ‘জলের ভুবন’ : হারিয়ে যাওয়া শৈশবযাপন ও একটি শহরচরিত্র

পর্ণা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা
Email ID : parna.bengali@tripurauniv.ac.in

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Memoir, Lost Childhood, City Character, Nostalgic, Historical Significance, Migration, Reminiscence, universal, timeless.

Abstract
Enakshi Roy's 'Joler Bhuvan' (2016) is such a memoir that is not only about her own childhood experiences, but also of various experiences of many people related to their childhood life which is nostalgic. It is reminded of the various materials left behind by many people related to their childhood life in the seventies and eighties, which are now a thing of the past. The sincere relationships of childhood, games, observance of vows, free-roaming in the bosom of nature, the tradition of fairs, the craze of puppet dancing, telegrams, postcards, inland letter cards, the khaki-coloured clothes of the postman, the coal engine of the railway car, the well-welder, the curd seller, floating paper boats in the rainwater, the wedding of dolls, etc. are being lost in the 21st century. Many of the joys of childhood life have been lost to today's generation. Therefore, the various elements of that lost childhood described in the memoir have special historical significance. It is also about being a living character of a city and being intimately involved with life. That city is Jalpaiguri in North Bengal. The history of the naming of Jalpaiguri district, the horror of floods, the nature of the Karala River, the Dharla River, the Rukruka River, the discovery of the Toto caste by Enakshi Roy's grandfather Jatindranath Roy, the sweetness of the language of Jalpaiguri city under the influence of the Rajbangshi language, the tradition and antiquity of the Jalpesh fair, the contribution of Nawab Hossain Mosharraf to Jalpaiguri, the words of Thakur Panchanan Barma, some historical facts of Jalpaiguri centered on Netaji-Gandhiji, historical information about the change of the route of the Darjeeling Mail, information about the city's traditional shops, schools and colleges - all these things are presented in the memoir in connection with life

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

experiences. Finally, the pain of being uprooted due to Enakshi Roy's migration from Jalpaiguri to Kolkata is added. There is talk of alleviating that pain through reminiscence. The style of the memoir captures a touch of poetry. The significance of the memoir, "The Water World," lies in its transcendence of the personal to become universal and timeless.

Discussion

প্রত্যেকের শৈশব জীবনের আধারে বয়ে যায় কোনো সময়বৃত্ত। অতীতের সেই সময়ের সৌধ গড়ে ওঠে আগামীর ফিরে দেখায়। লিঙ্গভেদে, জাতিভেদে, স্থানভেদে, যুগভেদে ধ্রুবসত্য স্মৃতিচারণা। তবে, স্মৃতির প্রকাশ বহুমুখী। স্মৃতির লিখন মাধ্যমে প্রকাশ যখন হয়ে ওঠে সর্বজনীন ও সর্বকালীন, তখন তা মর্যাদা পায় সাহিত্যের। এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবন' (২০১৬) এমনই এক আত্মজীবনী, যার শব্দের বুননে আছে শৈশবের অনুভূতির প্রখরতা আর আস্ত এক শহরের স্বভাব-চরিত্র-ইতিহাস। উত্তরবঙ্গের বুকে করলা নদীর কোল জুড়ে সেই শহরের নাম জলপাইগুড়ি। এণাক্ষী রায়ের অনুভূতিতে তাঁর শৈশবের আকর এই শহর —

> "খেলাধুলো, শিক্ষা, ঐতিহ্যের শহর জলপাইগুড়ি। সৌন্দর্যের শহর, শান্তির শহর। মন্থর ধোঁয়াহীন ধুলোহীন জীবন। মন্থর গা-এলানো নদী, শুয়ে থাকা চা-বাগান, রুপোলি বালির চর। পাখির শহর সবুজের শহর, আমার ভালোবাসার জলপাইগুড়ি।"[১]

শৈশব আর শহরের যখন রঙমিলান্তি হয়, পৃথক করা যায়না যখন একের থেকে অপরকে, তখন জীবন্ত শৈশবের সঙ্গে শহরও হয়ে ওঠে এক ব্যক্তিচরিত্র। এণাক্ষী রায় তাঁর শৈশবযাপনে শহরকে জারিত করেছেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাঁর পঞ্চাশোর্ধ জীবনের নানাবেলার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় শৈশববেলার প্রতি। তাই তাঁর স্মৃতিলিখনে জলপাইগুড়ির বৃত্তে শৈশব থেকে কিশোরী বয়সে পদার্পণের কথার বাইরে নেই পরবর্তী জীবনের কোনো উল্লেখ। নদী, গাছ, জঙ্গল, পশু-পাখি — প্রকৃতির অনাবিল আনন্দ দিয়ে ঘেরা জলপাইগুড়ি থেকে শিকড় উৎপাটিত হয়ে যায় যখন, এসে পড়তে হয় যখন কংক্রিটের জঙ্গলে, তখন স্মৃতিরোমন্থনে অতীতকে আঁকড়ে ধরে শান্তির নীড় অন্বেষণ ব্যতীত উপায়ন্তর থাকে না স্পর্শকাতর মানবমনের।

'জলের ভুবন'কে আপাতভাবে ব্যক্তি এণাক্ষী রায়ের শৈশবজীবনের টুকরো কথা মনে হলেও, এর মধ্যে মুক্তোর মতো গোপনে সযত্নে রাখা হাজার মনের অনুভূতি। মেদুর শহরের শিকড় উপড়ে নগরমুখী হতে বাধ্য হওয়া হাজার সত্তার বোবাকান্না। সময়স্রোতে হারিয়ে গেছে বা হারানোর পথে শৈশবের কত শত খেলা, আবেগ, মুহূর্তের বেহিসাবি আনন্দ। এণাক্ষী রায়ের জন্ম সত্তরের দশকে। একুশ শতকে পৌঁছে যখন ফিরে তাকালেন শৈশবে, তখন শৈশবের বহু যাপন হয়ে গেছে ইতিহাস। সঙ্গে একটা শহর বদলেছে তার রূপ। শহর জলপাইগুড়িকে শুধু আত্মস্থই করেছেন, তাই নয়। জলপাইগুড়ির সুপ্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানে তথ্যপূর্ণ ছবি তুলে ধরেছেন ব্যক্তিক অনুভূতির বুননে। এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে'র সেই বহুকৌণিক ক্ষেত্র লিখনটিকে করে তুলেছে যুগ ও যুগান্তরের সাম্পান।

একুশ শতকের শৈশবে যা কিছু ফসিল : মধ্যবিত্তের জীবনের মান বিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে একুশ শতকের মতো জৌলুষপূর্ণ ছিল না। সাদামাটা সরলবৃত্তে আবর্তিত হত তখন মধ্যবিত্তজীবন, সঙ্গে তার শৈশবজীবন। অথচ অনাড়ম্বর শৈশবে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা। সম্পর্কের সমীকরণেও ছিল তখন সেই নির্ভেজাল অন্তরের টান। তাই তুতো ভাই-বোনেরাও সহোদর সম্পর্কের থেকে কিছু কম অনুভূতির ছিল না। এণাক্ষী রায়ের জীবনে তেমন পারিবারিক-পাড়াতুতো সবাইকে নিয়ে ছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, চড়ুইভাতির অবাধ বিচরণ। শব্দে কান পাতা, শব্দ নিয়ে খেলা, শব্দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যন্ত্রসভ্যতার যুগে হারিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১-এ জন্ম নেওয়া এণাক্ষী শৈশবে শব্দতরঙ্গে নিজস্ব অনুভূতিগুলোকে লীন করে দিতেন। সেকথা শিশুবেলার ঝুলি থেকে —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ফুল ফোটার শব্দ আমি পেতাম, প্রজাপতিরা ঘাপটি মেরে বসে থাকত লঙ্কাজবা গাছের তলায়, শুকনো পাতায়। আমি সামনে গেলেই একসঙ্গে উড়ে যেত। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি সেই শব্দ। ফুলে ফুলে ফড়িং ঘুরত। ওদের পাখার ফরফর শব্দ গুনতাম। চাঁদের আলোয় একটা শীতল শব্দ থাকে। মনখারাপের রাতে কান্না হয়ে গলে—পড়ার শব্দের মতো। আমি জানি, চিনি শব্দগুলোকে। শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের শব্দের মতো হু-হু বিষন্নতার শব্দ আমি খুঁজে থাকি।"[২]

জীবনানন্দীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুধাবন ছোট থেকেই সহজাত ছিল স্পর্শকাতর মনের অধিকারিণী এণাক্ষীর। পরিবেশ-প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের খেলায় আজ আর মশগুল নয় শিশুরা। তবে, এণাক্ষী রায়ের শিশুকালে ছিল ফুল ফোটার বিস্ময়। বিকেল চারটেয় লিলিফুল ফোটা প্রত্যক্ষ করা ছিল সহজমনের আবিষ্কারবিশেষ। এছাড়াও বিকেল থেকে প্রকৃতির বুকে খেলে বেড়ানোর সময়সীমা চিহ্নিত হত শঙ্খধ্বনির সূত্রে। শঙ্খের শব্দে শিশুমনে সন্ধ্যা নামার অনুভূতি এখন অনেকাংশে অতীত।

প্রকৃতির বুকে শৈশববেলায় নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কল্পনা করা যে আসলে দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক বেড়াজালকে অস্বীকার করা, তা হিসাব করার মতো জটিলতা ছিলনা তখন। প্রাপ্তবয়স্ক এণাক্ষী রায় সেকথা জীবনের বহুপদে অনুধাবন করেছেন। বাস্তবটা বুঝেছেন যে, প্রকৃতির ছন্দে মেতে ওঠা ফুল-পাখির জীবনে সমাজের অঙ্গুলিহেলন নেই।

> "ফুল-পাখি-ফড়িয়ের দলে মিশেছি বলে, আমি তো আর ওদের মতো স্বাধীন নই। আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সমাজ।"[৩]

শিশু বয়সে জ্ঞানীয় অনুষদগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়না বলে, কার্য-কারণ সূত্র অমেলবন্ধনেও কিছু ভয়ার্ত বিষয় তাকে ঘিরে রাখে। এক্ষেত্রে অভিভাবকেরা অনেকসময় শাসনের সুবিধার্থে বা শিশুকে পরিস্থিতিবিশেষে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে নানান ভীতিউদ্রেককারী কল্পকাহিনী বা কখনও সচেতনতাধর্মী চিত্রকল্প শোনান যুগপরম্পরায়। যেমন— নিশির ডাক, ছেলেধরার ভয়, হায়নার ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি। একুশ শতকে কংক্রিটের যুগে এই জাতীয় ভয়ের প্রবণতা কমে আসছে শিশুমহলে। এখন বোধের প্রথম স্তর থেকেই শিশুদের ঘিরে আছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। তাই ভয়ের চরিত্রগুলোও বদলে যাচ্ছে। এণাক্ষী রায় তাঁর স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে' তাঁর শৈশবকালীন সেই ভয়ের অনুভূতিগুলোর কথা লিখেছেন। সেখানে আছে 'কানা হুলো ধরার ভয়', 'নিশির ডাক', 'ছেলেধরার ভয়', 'হায়নার ভয়', 'ভূতের ভয়', 'বাঘের ভয়'। অনেক শিশুর মতই এণাক্ষী রায়ের 'বাবা' সম্বোধনের পরিবর্তে ছিল সমার্থক নিভাষা। সেটি 'বাবান'। তাই তাঁর বাবানের কাছে ভয়ের গল্প শোনার অভিজ্ঞতা আর গল্পের অন্তিম পরিণতিতে একই নীতিকথা শোনা ছিল তাঁর আকর্ষণের বিশেষ ক্ষেত্র।

> "বাবান ঘুমানোর সময় গল্প বলতেন রোজ। ভূতের, বাঘের। সব গল্পের নায়ক বাবান নিজে। ভূত কেমন করে বাবানের কাছে মাছ চেয়েছিল। কেমন করেই-বা বাবানের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হল। বাঘবাবাজি কেমন বাবানকে না-খেয়ে ছেড়ে দিল ভালোমানুষ বলে। সব গল্পের শেষে থাকত ভালোমানুষদের কোথাও কোনও ভয় নেই।"[৪]

সত্তর-আশির দশকে ছিল মেলা, যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচের উন্মাদনা। নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় ক্ষণিকের আনন্দ-অভিমান। মেলা মানেই রকমারি পসার আর নাগরদোলার আকর্ষণ। এণাক্ষী রায়ও সেইসব অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও জলপাইগুড়িতে নির্জন দুপুরে তাঁর মায়ের সঙ্গে রিকশায় ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে ছিল রিকশার 'ক্যাঁচকোঁচ' শব্দের মাদকতা। গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন মোটরচালিত রিক্সার দাপটে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে রিকশার 'ক্যাঁচকোঁচ' আর 'নির্জন দুপুরে'র মতো আরও অনেক ছোটখাটো ভালোলাগার আস্বাদ। শহুরে প্রতিযোগিতা এখন মুছে দিচ্ছে ছোট ছোট অনুভূতির বিশুদ্ধ আনন্দ। যদিও ঐতিহ্যের সঙ্গে অগ্রগতিকে তাল মেলাতে বিসর্জন দিতে হয় অতীতের কিছু উপাদান। এটাই বাস্তব। তাই আক্ষেপ আর স্মৃতিচারণার মধ্যেই জীবন্ত থাকে নির্ভেজাল আনন্দানুভূতি। শৈশব জীবনে আনন্দের উপকরণ কম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। ছিলনা টেলিভিশন, টেলিফোন। খবর আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামের সঙ্গে ছিল দুঃসংবাদ পাওয়ার অজানা আশঙ্কা। সঙ্গে ছিল পোস্টকার্ড। আর ছিল হালকা নীল রঙের ইনল্যান্ড লেটার কার্ড। নব্বই দশকের শেষ বা বিশ শতকের শুরুতেও ছিল পত্র-বিনিময়। কিন্তু একুশ শতকে প্রয়োজন বা বাণিজ্য ব্যতীত মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য চিঠি নয়, আছে হরেক বৈদ্যুতিন মাধ্যম। তাই জীবন থেকে ডাকপিওন হারিয়ে যাচ্ছে। ফিকে হয়ে যাচ্ছে খাকি পোশাক পরিহিত ডাকহরকরার ডাক।

রেলগাড়ির ইঞ্জিন ছিল কয়লার। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় মামাবাড়ি আসার পথে শিশু এণাক্ষীর চোখে ছিল এই কয়লার ইঞ্জিনের বিস্ময়। তাঁর সেই রেলযাত্রার অভিজ্ঞতাসূত্রে উঠে এসেছে একটা সময়ের রেলযাত্রার টুকরো ইতিহাস।

> "কু-ঝিক্-ঝিক্ কু...উ...উ...। কয়লার ইঞ্জিনটা খুব হাঁফাত। হলদিবাড়ি থেকে এইটুকু রাস্তা। জলপাইগুড়ি আসতেই ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দে শ্বাস ফেলত যেন। বাবা সঙ্গে থাকলে দেখাত, কেমন করে জল খায় ট্রেন।... প্রত্যেকের সঙ্গে থাকত সুটকেস আর হোল্ডল। হোল্ডলের মধ্যে বিছানা-বালিশ সব। সেকেন্ড ক্লাস কোচে তখন থাকত একটা কাঠের লেডিস ক্যুপ। দরজা ভেতর থেকে বন্ধের ব্যবস্থা সমেত।"[৫]

জীবনের বিস্ময়গুলোতে অভিভূত হয়ে থমকে দাঁড়ানো দেখে গতানুগতিক মানুষজন সেই থমকে দাঁড়ানো মানুষকে 'বোকা' বলে চিহ্নিত করে। এমন অভিজ্ঞতা এণাক্ষী রায়ের নিজস্ব জীবনে ঘটেছে। জীবনের বিস্ময় অনুধাবন করার মতো স্পর্শকাতর সবাই হয়না। স্পর্শকাতর এই মন-মনন গড়ে ওঠে শৈশবের বিকাশের স্তরে। কখনও অনুঘটকের মতো ক্রিয়া করে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি, কখনওবা পূর্বপ্রজন্মের অনুপ্রেরণা। এণাক্ষীর জীবনে সত্য ছিল এই দুই মাধ্যমই। প্রথমত জলপাইগুড়ির মতো আন্তরিক শহর, দ্বিতীয়ত তাঁর বড়পিসির প্রভাব; যিনি বাড়িতে গাছ কাটলে অন্তরের বেদনায় কাতর হয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিতেন। তাইতো, ঠাকুরের প্রসাদ বাতাসার মধ্যে থাকা কালো পিঁপড়ে অনিচ্ছাকৃত খেয়ে ফেলায়, শিশু এণাক্ষীর মনে জেগে ওঠে পিঁপড়ে হননের আক্ষেপ আর মনখারাপের কাঞ্চনজঙ্ঘা।

কুয়োর ব্যবহার কমে এসেছে এখন। তখন কুয়োর সঙ্গে ছিল শিশু এণাক্ষীর মনে রূপকথার কল্পনা। যেমন, মনে মনে ভাবতেন, করলা নদীর সঙ্গে বুঝি যোগ আছে তাঁদের বাড়ির কুয়োর। সঙ্গে মানুষের ছিল কুয়ো-ঝালাইয়ের পেশা। শীতের শেষে 'কুয়ো-ঝালাই-ই-ই-ই' ডাকে পাড়ায় ডাক পড়ত বাড়ি-বাড়ি। এণাক্ষী রায়ের ছিল প্রকৃতির আনাচে-কানাচে প্রেম। সযত্নে তাঁর পোষা মাছ ছিল কুয়োয়। কমলা রঙের মাছটি জলের পোকা খেত। প্রত্যেকবার কুয়ো ঝালাইয়ের সময় তাই সচেতন করে দিতেন, মাছের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। এভাবেই আগলে রাখতেন শৈশবের নির্ভেজাল ভালোবাসাগুলো। ছিল তখন দইওয়ালা, টিকাওয়ালার নিত্য আসা-যাওয়া। কালো কালো বাতাসার মতো কয়লার টিকা ফুলের মতো সাজিয়ে আনতেন টিকাওয়ালা। হুঁকো বা ধুনোর জন্য নেওয়া হত এই টিকা। আবার মাথায় ঝুড়ি নিয়ে বিক্রি হত হুকোর তামাক। পাড়ায় পাড়ায় হাঁক-ডাক 'দই চাই-ই-ই দো-ও-ও-ই-ই-ই।' এণাক্ষী রায়ের একান্নবর্তী পরিবারে একত্রে ছিল দই কেনার চল। নিছক কৌতূহলে সবাই ভিড় জমাত। তখন মানুষের হাতে সময় ছিল। ইঁদুর-দৌড়ে দৌড়তনা তখন সবাই। তাই একজনের দই কেনা ঘিরে থাকত অনেক কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। নেওয়া হত মাত্র চার আনা বা আট আনার দই। তবু গ্রাহকের ছিল অনেক শর্ত। যেমন, জল না কাটা হাঁড়ি থেকে চাপধরা দই চাই। আবার তারপর দইতে জল কেটে যাওয়া হাঁড়ি থেকে জল ফাউ চাই। দইওয়ালাও শর্তগুলি মেনে নিতেন বিনা বাক্যব্যয়ে। এমনই ছিল তখন ক্রেতা-বিক্রেতা সুসম্পর্ক।

বর্ষা-বৃষ্টি আর মেঘলা দিন মানেই ছিল পাড়াময় খিচুড়ির সুবাস। ছোটদের কাগজের নৌকা ভাসানোর পালা। এণাক্ষী রায়েরও ভালো লাগত নৌকা ভাসাতে। খাতার পাতা, খবরের কাগজের নৌকা ভাসালেও খোঁজ করতেন ক্যালেন্ডারের। কারণ ক্যালেন্ডারের মোমপালিশ পাতা জলে সহজে ভেজেনা, টেকসই হয় কাগজের নৌকা। কিন্তু এই ক্যালেন্ডার দিয়ে নৌকা বানানোয় ছিল ছোটদের প্রতি বড়দের ট্যাবু। কারণ, তৎকালীন অধিকাংশ ক্যালেন্ডারে ছিল দেব-দেবীর ছবি। তাই সেগুলি পুরনো হলেও ছেঁড়া বারণ। পরবর্তীতে কোনোটা আবার বাড়িতে চুমকি দিয়ে বাঁধানো হত। তাই নৌকা বানানোর উদ্দেশ্যে গাছপালা-ফুল-পাখি আঁকা ক্যালেন্ডারের খোঁজে থাকতেন শিশু এণাক্ষী। তাঁর কাগজের নৌকা ভাসানোর অভিজ্ঞতা লিখনের মধ্যে আছে তৎকালীন শত শিশুর আবেগ আর উন্মাদনা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কাঁচা ড্রেনগুলোর মধ্যে দিয়ে তখন জল যায় সাঁইসাঁই করে। এত পরিষ্কার তখন, যে, তলার বালি পর্যন্ত দেখা যায়। নৌকাগুলো ছোট। কালভার্টের তলায় ঢুকে গেলে উদগ্রীব হয়ে থাকি আমরা। কারটা আবার আটকিয়ে যায়। কালভার্টের তলা থেকে সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে এলে সমস্বরে চিৎকার ওঠে 'বারাইছে, বারাইছে-এ-এ।"[৬]

তখন মেয়েদের চুল ভালো হওয়ার আশ্বাস দিয়ে স্কুলে পড়াকালীন তুলনায় বেশ বড় বয়স অবধি ন্যাড়া করার প্রবণতা ছিল। এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখনেও আছে তাঁর এবং বাড়ির বোনেদের একসঙ্গে 'ন্যাড়ামুণ্ডি' হওয়ার অভিজ্ঞতা। বন্ধু-বান্ধবদের পুতুলের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। এই পুতুলের বিয়েকে কেন্দ্র করে অভিভাবকেরা রান্নার আয়োজন করতেন। এণাক্ষী রায় সেকথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও ভাই-বোনেদের মধ্যে ছিল বাঁশ কেটে ফুলদানি তৈরির প্রতিযোগিতা, কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী শিশুদের মধ্যে ছিল প্রত্যেকের বাড়ির সামনে পাহাড় তৈরির প্রতিযোগিতা। তখন ছিল বায়োস্কোপ ওয়ালাকে ঘিরে পাড়ায় কচিকাঁচা থেকে শুরু করে বড়দের জমায়েত। সময়ের স্রোতে বায়োস্কোপের বিষয় বদলাতে দেখেছেন। আর এখন তো বায়োস্কোপওয়ালা নিশ্চিহ্ন। ছোট ছোট বাক্স মাথায় নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে আগমন জানান দিত বায়োস্কোপওয়ালা। এণাক্ষী রায় সেই বায়োস্কোপ দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন —

> "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখ বাবুয়া, তাজমহল দেখ বাবুয়া।... মাত্র পঁচিশ পয়সা দিলে, ফুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখাত। কিছু ছবি সরে যেত পর পর। আস্তে আস্তে এইসব বায়োস্কোপের ছবিও পালটে যাচ্ছিল। তাজমহলের বদলে হেমামালিনী, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন। মাঠের মধ্যে পর্দা টাঙিয়ে সরকারি প্রচারমূলক ছবি দেখাত। আমরা বলতাম পাব্লিসিটি এসেছে। যে কোনও চলমান ছবিতেই ছিল বিপুল উত্তেজনা।"[৭]

জলপাইগুড়ির শৈশবে এণাক্ষী উল্লেখ করেছেন নানান ব্রতপালন ও পুজো-পার্বনকে কেন্দ্র করে উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের সমবেত আনন্দের কথা। যেমন আছে, কাসুন্দিপুজো, বড়িপুজোর মতো আকর্ষনীয় ব্রত। বাড়িতে ছিল কাঠের বড় হামানদিস্তা, যাকে বলা হত 'ছামগান'। সেই ছামগানে অক্ষয় তৃতীয়ার সকালে কাসুন্দি প্রস্তুত করা হত। প্রথা ছিল প্রথমে সরষে, গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা ও আরো বারো রকমের মশলা, এর সঙ্গে একটি কাঁচা আম পোঁটলা বাঁধার। তারপর সেই পোঁটলাটি বাড়ির বড় বউ মাথায় নিয়ে কুয়োপাড়ে বসতেন। অন্যান্য এয়োগণ বালতি করে তাঁর মাথায় জল ঢালতেন। সেই মশলাধোয়া জলে স্নান করে ছামগানে মশলা কোটা হত। শুধুমাত্র বাড়ির সদস্যরাই নন, পাড়া - প্রতিবেশী, পরিচিত - পরিজন এয়ো সবাই এসে যোগ দিতেন এই কাসুন্দিপুজোয়। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি সহযোগে সবার একত্রিত যোগদান শিশুদের কাছে ছিল অপার আনন্দের ক্ষেত্র। এছাড়াও যে শিশুরা পুতুলের বিয়ে দিতে অভ্যস্ত, তারা যখন দেখে বড়ির বিয়ে। সেই বিষয়টিও তাদের কাছে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ। এণাক্ষী রায় তাঁর বাড়ির সেই বড়িপুজোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কলাইয়ের ডাল অর্থাৎ বিউলির ডাল ভিজিয়ে তা বাটা হত। দুটি বড় প্রতীকী বড়ি তৈরি করা হত। সেই দুটি বড়ির একটি বর, একটি কনে। ধান-দুব্বোর মুকুট-সিঁদুর পরিয়ে তাদের বিয়ে দেওয়া হত। শিশুদের চোখে তখন কনে বড়ি লাজুক মানব কনের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। এরপর রৌদ্রে শুকনো করতে দেওয়া হত বড়ি। মাঝে থাকত এই বর-কনে বড়ি। এই দুই বড়িকে ঘিরে থাকত বাকি ছোট বড়ি। ছোট বড়িগুলি দেওয়ার অনুমতি পেত বাড়ির ছোটরা। শুকনো না হওয়া অবধি ছোটদের খেলা ছিল বড়িগুলি সযত্নে পাহারা দেওয়া। ছোটদের আকর্ষণ ছিল বর-কনে বড়ি। এণাক্ষী রায় লিখেছেন, দেখতে দেখতে চোখের সামনে বর-কনে বড়ি পুরানো হয়ে যেত। তারপর শিশুমহলের উত্তেজনা ছিল রান্নার মধ্যে বর-কনে বড়ির অন্বেষণ। বড়ির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে সারাবছর বড়ি খাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যেতনা। 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষে' এই বড়ির বিয়েকে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, 'বিয়ে' বিষয়টির সঙ্গে 'উর্বরা শক্তি'র সম্পর্কের প্রতীক ছোট বড়িগুলি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে —

> "বাংলার লোকায়ত জীবনে বড়ির বিয়ে এক আকর্ষণীয় ঘটনা। ...প্রথম দুটি বড়ি যেন মা-বাবা। লক্ষণীয় এরাই প্রথম বড়ি। পরবর্তীকালের বড়িগুলি যেন এদেরই সন্তান-সন্ততি। 'বিবাহ' নামক সমাজ স্বীকৃত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তাদের উর্বরাশক্তির স্বীকৃতি মিলেছে। এ প্রসঙ্গে সাদৃশ্যমূলক যাদু-বিশ্বাসের দিকটিও উপেক্ষিত নয়। যেন, বর-বউর সম্মিলিত উর্বরশক্তির ফলেই পরবর্তীকালের শত শত বড়ি-সন্তানের আবির্ভাব।"[৮]

এণাক্ষী রায় তাঁর বাড়িতে বড়ির বিয়ের সময়কাল উল্লেখ না করলেও, এই বড়ির বিয়ের সময়কাল নিয়ে 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' উল্লেখ করেছে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষ। বড়ির বিয়ে লোকসমাজের সুপ্রাচীন প্রথা। বর্তমানে আচার-অনুষ্ঠানে বদল এসেছে। মানুষের মধ্যে বড়ি বাড়িতে তৈরি করে খাওয়ার প্রবণতা কমে এসেছে সময়ের অভাবে। এখন শহুরে জীবনে এসেছে প্যাকেটজাত বড়ি। তবুও সংখ্যায় অপ্রতুল হলেও এখনও গ্রামাঞ্চলের কোনো কোনো বাড়িতে প্রচলিত রয়েছে বড়ির বিয়ে।

কেবলমাত্র এণাক্ষী রায় তাঁর ব্যক্তিগত শৈশব অভিজ্ঞতা বর্ণনে নিজের জীবনের সীমায়িত ক্ষেত্রই তুলে ধরলেননা। এই শৈশবের ছবি বহু মানব-মানবীর শৈশবের প্রতিফলন। সময়ের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের শৈশব জীবনই বিগত হয়। কিন্তু এই শৈশবকথাগুলি তো প্রজন্ম থেকেই অনেকাংশে বিগত হয়ে একুশ শতকের শিশুদের চোখে ফসিল-সমান। তাই স্মৃতিলিখনে সেই ইতিহাস জীবন্ত করে রাখার প্রয়াসে 'জলের ভুবন' অনন্যতার দাবিদার।

ইতিহাস ও জলপাইগুড়ির জলছবি : ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলা; যার উত্তরে ভুটান এবং দক্ষিণে কোচবিহার ও বাংলাদেশের পঞ্চগড়। এই জলপাইগুড়ি জেলায় এণাক্ষী রায়ের জন্ম থেকে স্কুল জীবন। এই জেলার নামকরণ বিষয়ে এণাক্ষী রায় নানাবিধ মত উপস্থাপন করেছেন তাঁর স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে'। যেমন, অত্যন্ত প্রচলিত কথা— জলপাই গাছ থেকে আগত 'জলপাইগুড়ি' নাম। কিন্তু এখানে বনাঞ্চলে কোথাও জলপাইগাছের অবশেষ নেই বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। আরও একটি নামকরণ বিষয়ক মতবাদ হল — সম্পূর্ণ অঞ্চলের নাম আগে জল্পেশ্বর ছিল, জল্পেশ্বরের অপভ্রংশ হল 'জলপাইগুড়ি'। এণাক্ষীর মতে, যুক্তিযুক্ত মতবাদ হল, রাজা জল্পেশ্বরের রাজধানী ছিল এই জলপাইগুড়ি জেলা অঞ্চল। জল্পেশ্বরের মন্দিরটি এই রাজার নির্মিত। মন্দিরের নাম থেকে জনপদের নাম অথবা বিপরীতে জনপদ থেকে মন্দিরের নাম 'জলপাইগুড়ি' হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করেন তিনি। আরও একটি সূত্রের কথা লিখেছেন এণাক্ষী। ভুটানী শব্দ 'যে-লে-রি-গো-পে'-এর অর্থ যেখানে গরম কাপড় পাওয়া যায়। একসময় জলপাইগুড়ি ছিল কেনাকাটার কেন্দ্রস্থল। তাই এই ভূটানী শব্দ থেকেও 'জলপাইগুড়ি' নামের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা যুক্তিসঙ্গত।

জলপাইগুড়ি শহরের সঙ্গে বন্যা সম্পর্কিত। ১৯৬৮ সালের লক্ষ্মীপুজোর সময়ে ভয়াবহ বন্যা ঐতিহাসিক। সেই বন্যার দুঃস্বপ্ন বয়ে বেড়াত তার পরবর্তী বহু বছর শহরের মানুষজন। ১৯৭১-এ জন্ম এণাক্ষী রায়ের। ছোট থেকে তাই বন্যার আতঙ্ক শুনতে শুনতেই বড় হয়েছেন তিনি। তিনি লিখেছেন, জলপাইগুড়ি শহরে একটা সময় শহরবাসীর জন্মের সালের সূত্রে অবধারিতভাবে চলে আসত বন্যা। যেমন, জিজ্ঞাসা করা হত, বন্যার আগে জন্ম নাকি বন্যার পরে জন্ম। শৈশবের এণাক্ষী কল্পনায় চাক্ষুষ করতেন জলপাইগুড়ির বন্যা। নেহাতই তাঁর সরল মন কোনো ক্ষতির প্রত্যাশা না করে পুনরায় বন্যা প্রার্থনা করত, শুধু সেই ছবিগুলো মিলিয়ে দেখার ছেলেমানুষিতে।

> "বন্যার বছর! ওহ্ কী করে বাঁচলেন! কী খাইসিলেন ওই কয়দিন? ...এইসব কথাবার্তা তখনও অবধি চলে আসছিল। সেই বন্যা আমার দেখা হয়নি। সেইসময় হওয়া চাল লুটপাটের গল্প শুনেছি। মানুষ ভেসে যাওয়ার গল্প শুনেছি। ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যুর কথা শুনেছি। কেউ জানত না, আমি তখনও মনে মনে আর একটি বন্যা চাই, কল্পনার ছবিগুলো মিলিয়ে নেওয়া জন্য।"[৯]

আটষট্টির বন্যার পর তিস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে চলেছিল জলপাইগুড়ি শহরের সমতল থেকেও। তাই পরে বেশি বৃষ্টি হলেও মানুষের মনে বিগত সেই বছরের ত্রাস জাঁকিয়ে বসত। 'উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে নদীর প্রভাব' প্রবন্ধে অচিন্ত্য বিশ্বাসও উল্লেখ করেছেন সেই বন্যার ভয়াবহতার ছবি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "পদ্মার মতো তিস্তাও 'সর্বনাশা' রূপে পরিচিত। বিশেষত ১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর স্মৃতিতে নিয়ে মানুষ একথা মনে রাখবে। তার সর্বনাশী ও আসুরিক শক্তি জনমনে ভয়ের সঞ্চার করেছে কালে কালে। এখনও বৃষ্টির দাপটে, নদীর নাব্যতা কমে জলধারায় পরিপূর্ণ তিস্তাকে দেখলে মানুষ ভয়ংকর স্মৃতির পটে আঁকা ছবি, কিংবা ভয়ংকর বন্যার চিত্রের কথা মনে করে আর শিউরে ওঠে।"[১০]

বন্যার আতঙ্ক নিয়েও তিস্তাকে ভালোবাসে জলশহরের মানুষ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিস্তার বিপন্নতার কথায় চিন্তিত হয়ে ওঠে সবাই। তিস্তার গতিপথে পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্র উঁচু হয়ে গেছে নদীখাত। তাই বিপদসীমার উপর তিস্তার জল। তিস্তায় বন্যারোধে বাঁধ নির্মাণ নদীর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে। তাইতো নদী থেকে শহর নিচু হয়ে পড়েছে। তিস্তার শাখানদী করলায় জল উপচে পড়ে। সেই নিয়েই আঁকা হয়ে আছে এণাক্ষী রায়ের মননে জলশহরের জলছবি, যা তিনি স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে' শব্দে-শব্দে এঁকেছেন।

এণাক্ষীর লেখায় আছে করলার পাশাপাশি ধরলানদীর কথা। আছে ধরলানদীর গতিপথ পর্যবেক্ষণের কথা। স্কুলফিরতি কিশোরী দেখত, ওপারে ফার্মেসি কলেজ, হাসপাতালের মর্গ ; যার পাশ থেকে ধরলা নদী ফার্মেসি কলেজকে পাশ কাটিয়ে কেমন ছন্দে চলেছে। উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে আছে ধরলানদীর ইতিহাস।

ধরলা নদীর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে 'লোককথার' উল্লেখ করেছেন ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত' গ্রন্থে। বোড়ো-ধিমালদের বিশ্বাস দেবী তিস্তার স্বামীর নাম ধরলা; আদিবাসীদের দু-একটি গানে ধরলাকে দেবী তিস্তার স্বামীরূপে উল্লেখ করা আছে।

"কালিয়াগঞ্জের কালা সুতা
তাক দিয়া গাঁথি নো মালা
ওই লা চলনের বাজে-ধরলো
গে পাড়ে গালি,
হইগে তিস্তা বুড়ি হাউসালী।"

কারো কারো মতে ধরলা নদীরই অন্য নাম 'তোরসা'। এই 'সা' এর প্রয়োগেও বোড়ো কাছারি ভাষার লক্ষণ।[১১]

এছাড়াও এণাক্ষীর স্মৃতিলিখনে আছে জলপাইগুড়ির 'রুকরুকা' নদীর কথা। ছোট নদী রুকরুকার কথা অনেকেরই কাছে অজ্ঞাত বলে আক্ষেপ করেছেন লেখিকা। রুকরুকাকে কখনও 'শীর্ণ স্রোতস্বিনী', কখনও 'রোগা নদী' বলে উল্লেখ করে নিজের সঙ্গে সমীকৃত করেছেন। ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা নদীটিকে ভালোবাসেন এণাক্ষী। 'শহরের ভুলে-যাওয়া মেয়ে', 'ছোট্ট সরু সেতু', 'সামান্য জল' নিয়ে বয়ে যাওয়া রুকরুকার অস্তিত্ব বারংবার তাঁর নিজেরই প্রতিচ্ছবি বহন করে বলে অনুভব করেছেন। লিখেছেন অন্তরের সেই সংযোগের কথা।

এণাক্ষী রায়ের ঠাকুরদা যতীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন তৎকালীন সরকারি ফেরি ইনস্পেক্টর, উদাসীন মানুষ। এমনই উদাসীনভাবে একদিন লাঠিয়াল পাচককে সঙ্গে নিয়ে দূর-দূরান্তে হেঁটে হেঁটে হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েক ঘর ব্যতিক্রমী প্রজাতি 'টোটো'। উত্তরবঙ্গে পরিচিত 'রাজবংশী', 'কোচ', 'রাভা' প্রজাতি। কিন্তু টোটো তখন ব্রাত্য। প্রবল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে 'টোটো'রা। এই 'টোটো'দের প্রত্যক্ষ করে তিনি সেইসব তথ্য নিজের দপ্তরে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জমা করেন এবং ঈষৎ বাঁকা বড় বড় অক্ষরে বিস্তারিত লিখে রাখেন টোটো জাতির জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ। সেই তথ্য তুলে দেন প্রিয় বন্ধু চারচন্দ্র সান্যালকে। ইতিহাসের পাতায় টোটো জাতির সরকারি স্বীকৃতিলাভ প্রসঙ্গে প্রিয় বন্ধুর নামোল্লেখ থাকলেও ইতিহাসে উল্লিখিত হয়নি তাঁর ঠাকুরদা যতীন্দ্রনাথ রায়ের নাম। তিনি জীবনের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি ছিলেন বলে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোনোদিন উদ্যোগী হননি। কিন্তু এণাক্ষী রায়ের স্মৃতিলিখনের তথ্যে নতুন করে গড়ে উঠল টোটোজাতিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে ও তাঁদের দুর্দশা নিরসনে যতীন্দ্রনাথ রায়ের কৃতিত্বের ইতিহাস। ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসে চারুচন্দ্র সান্যালের জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির ক্ষেত্র। যেমন, 'Rajbansis of North Bengal', 'The Limbus' এবং সর্বোপরি টোটোজাতির কথা আছে যে গ্রন্থে, সেটি 'The Meches and the Totals of North Bengal'.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জলপাইগুড়ির ভাষার মিষ্টত্ব প্রসঙ্গে রাজবংশী ভাষার সংমিশ্রণের তথ্য উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। লিখেছেন—

> "আমাদের জলপাইগুলির তাবৎ মানুষের ভাষায় রাজবংশী ভাষার সুন্দর একটি মিশেল আছে। করতেছি, আসতেছি, যাবা খাবা, ভারি মিষ্টি সে ভাষা।"[১২]

কাজের সন্ধানে নগরমুখী বাহে, রাজবংশীদের কথা লিখেছেন স্মৃতিকথায়। শহরে আসার পর তাঁদের পুরুষেরা রিকসা চালানো বা কামলার কাজে যোগদান করত। স্ত্রীলোকদের ছিল শহরে এসে বাসনমাজা, রান্নার কাজে নিযুক্ত হওয়া। গ্রামের চাষির ছেলে বাধ্য হয়ে শহরে রিকসা চালায়। শহরে অনেক সময় ভূলুণ্ঠিত হয় তাঁদের সম্মান; জাগে অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু রোজগারের আশায় হাল ছাড়েননা তাঁরা। কামলা করতে আসা মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত। তাই অনেকসময় পয়সার চেয়েও কাজের শেষে পেট ভরে ভাতের প্রত্যাশা থাকত তাঁদের।

> "আমাদের জলের জীবন, তিস্তার রুপোলি মিহি বালি, বাঁধের ওপরে লুকানো চোরকাঁটা, দোলনাপুল, দূরের আলোকোজ্জ্বল তিস্তা ব্রিজ, টাউন ক্লাবের মাঠ, আমাদের ভালোবাসা, ইতিহাসের গন্ধ লেগে থাকা দেবী চৌধুরানি মন্দির, আর জল্লেশের মেলা। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে করলা নদী।"[১৩]

জল্লেশের মেলা জলপাইগুড়ির গর্ব। এণাক্ষী রায় জল্লেশের মেলাকে অভিহিত করেছেন তাঁর সম্পূর্ণ জীবনে দেখা সবচেয়ে বড় গ্রাম্য মেলা রূপে। শিবের অপর নাম জল্লেশ্বর। জল্লেশ্বরের জল্লেশ মন্দিরটি জলাপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি থেকে কিছু দূরে জরদা নদীর তীরে অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো এক শিবরাত্রির দিন থেকে এই মেলার সূচনা। পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রাচীন মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম জল্লেশ মেলা। জলপাইগুড়ির রাইকতপাড়ার রাজবাড়ির সুবিখ্যাত মনসাপূজার মেলার কথাও উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী। আঞ্চলিক এই বৃহৎ মেলা বসত রাজবাড়ি সংলগ্ন বিখ্যাত দিঘির পাশে। এই প্রসঙ্গে আছে রাজবাড়ির সিংহদুয়ারের বিশেষত্ব। এই সিংহদুয়ার এক অসাধারণ স্থাপত্য, যা এশিয়ার মধ্যেও অন্যতম। বিশেষত্ব হল, এটি কোনোপ্রকার কংক্রিট বা লোহালক্কর ব্যতীত কেবলমাত্র চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি স্থাপত্যশৈলী।

স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে, জলপাইগুড়ির মুক্তাভবন থেকে প্রতিদিন সকাল ন'টার সাইরেনের কথা। সারা শহর জুড়ে শোনা যায় সেই সাইরেন। নস্টালজিয়ার সঙ্গে আছে নবাব হোসেন মুশারফের বাড়ি অর্থাৎ নবাবাবাড়ি বা প্রাসাদের কথা; যা পরবর্তীতে হয়েছে জলপাইগুড়ি কোর্ট এবং হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। নবাব হোসেন মুশারফ পেশায় ছিলেন একজন আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ। ফয়জন্নেসা বেগমকে বিবাহ করার সূত্রে নবাব হোসেন মুশারফ উনিশ শতকের শেষ থেকে জলপাইগুড়িতে বসবাস শুরু করেন। ইতালি আর জার্মানি থেকে শিল্পী এনে তৈরি করেন তাঁর প্রাসাদোপম বসতবাড়ি। তিনি যেহেতু পেশায় আইনজ্ঞ ছিলেন, তাই আইনজ্ঞ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা বার কাউন্সিলে। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের তৎকালীন রাজা প্রসন্নদেব রাইকতের পাকিস্তান থেকে ঋণ করা টাকা মকুব করতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে আবেদন করে মঞ্জুর করান। জলপাইগুড়িকে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নবাব হোসেন মুশারফের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যতটা চর্চার প্রয়োজন, তেমনটা হয়নি বলে উল্লেখ করে আক্ষেপ করেছেন এণাক্ষী রায় তাঁর স্মৃতিলিখনে। নবাব হোসেন মুশারফের নামে জলপাইগুড়ি শহরের বুকে কোনো সৌধ বা স্থাপত্য বা রাস্তার নাম হওয়া একান্ত কাম্য বলে উল্লেখ করেছেন এণাক্ষী।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নামেও হয় মেলা। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা উনিশ শতকের শেষে তৎকালীন এম. এ., বি. এল. পাশ করে সুশিক্ষিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করার জন্য রায়সাহেব উপাধি অর্জন করেছিলেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রাজবংশী সম্প্রদায়কে তথাকথিত উচ্চজাতের সমকক্ষ করার চেষ্টা ও তফশিলি তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নেন তিনি। রাজবংশী ভাষা নিয়ে গর্ব করতে শেখান পঞ্চানন বর্মা। রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চাতেও বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে উত্তরবঙ্গে তাঁর নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় — 'কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে আরও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রভূমি তৈরি হয়েছিল। যেমন, 'কংগ্রেসপাড়ার মাঠ' নামে খ্যাত মাঠটি থেকে প্রথম 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সময় ১৯৩৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগ দিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে। তৎকালীন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে নেমেছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে। সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসু ছিলেন। সেই স্মৃতিবিজরিত মাঠের সূত্রে পাশের গলির পাড়ার নাম হয় এরপর থেকে 'কংগ্রেসপাড়া'। আবার গান্ধিজি যখন জলপাইগুড়ি আসেন, তিনি ফণীন্দ্রদেব স্কুলের মাঠে ভাষণ দিয়েছিলেন। উল্লিখিত হয়েছে, অন্যান্য স্কুল-কলেজের নাম। যেমন, সোনাউল্লা হাই স্কুল, জেলা স্কুল, সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুল, গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, কদমতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দেশবন্ধু স্কুল, হোলি চাইল্ড, আনন্দচন্দ্র কলেজ, প্রসন্নদেব রাইকতের নামে একটিমাত্র মেয়েদের কলেজ অর্থাৎ পি.ডি. মহিলা কলেজ।

একুশ শতকে জলপাইগুড়ির বা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার সংযোগে বহু রেলের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সত্তর-আশির দশকে তৎকালীন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ছাড়া বড় ভরসা ছিল দার্জিলিং মেইল। এই দার্জিলিং মেইলের পথ-পরিবর্তের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসও আছে এণাক্ষী রায়ের এই স্মৃতিলিখনে। তিনি যে তথ্য তুলে ধরেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০ সালের পূর্বে এই ট্রেন কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি মাত্র কয়েকটা বড় স্টেশনে থেমে নয় ঘণ্টায় পৌঁছাত। তখন দার্জিলিং মেলের গতিপথ ছিল অর্বিভক্ত নদিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কুষ্টিয়ার কাছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দিয়ে তখন পদ্মা পেরোতে হত। ইঞ্জিন বদলানোর জন্য ট্রেন পার্বতীপুর স্টেশনে থামত অনেকক্ষণ। কিন্তু ১৯৫০ সালে ঘটেছিল ট্রেনে এক নারকীয় হত্যালীলা। সেকথার বীভৎসতা লিখেছেন এণাক্ষী —

> "৫০ সালে দার্জিলিং মেইল সান্তাহার স্টেশন ছাড়ার পর, ট্রেন থামিয়ে ভয়াবহ এক নিষ্ঠুর হত্যালীলা চালানো হয় তৎকালীন পাকিস্তানের ভূখণ্ডে। শিয়ালদা থেকে জলপাইগুড়িগামী দার্জিলিং মেইলে সেদিন রক্তগঙ্গায় ভাসছিল গাদা গাদা লাশ। তারপরই ফারাক্কায় থেমে ফেরি পার হয়ে কলকাতায় আসার ব্যবস্থা চালু হল, যতদিন না ফারাক্কা ব্রিজ তৈরি শেষ হল।"[১৪]

এরপর ফারাক্কা ব্রিজ হওয়ার পর দার্জিলিং মেইলের যাত্রাপথ একটানা উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও যাত্রা অব্যাহত।

তৎকালীন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘিরে শহরে ছিল প্রবল উত্তেজনা। নিজের বাড়ির কেউ পরীক্ষা না দিলেও পাড়া-প্রতিবেশী বা দূর সম্পর্কের পরিচিতজনদের জন্যও ছিল আগ্রহ। তখন ছিলনা এমন বৈদ্যুতিন মাধ্যম। ফলাফল জানার একমাত্র মাধ্যম গেজেট। জলপাইগুড়ি শহরের জমজমাট কদমতলার মোড়ে তখন গেজেট নিয়ে ছেলেরা বসত। রোল নম্বর বলে রেজাল্ট জানতে হত। অর্থমূল্য নির্ধারিত হত প্রাপ্ত ডিভিশনের উপর ভিত্তি করে। যেমন, ফার্স্ট ডিভিশন ফল করলে দশ টাকা, সেকেণ্ড ডিভিশনে পাঁচ টাকা, থার্ড ডিভিশনে দুই টাকা, অকৃতকার্য হলে তার জন্য বিনা পয়সা।

শহরটাই ছিল আন্তরিকতার মোড়কে ঘেরা। সেখানে, পাড়ার দুর্গাপূজাকে মানুষ তাঁদের নিজের বাড়ির পুজো মনে করে হাতে হাত মিলিয়ে পুজোর কাজ সামলাতেন। মানুষে-মানুষে আন্তরিক টান এতটাই ছিল যে, স্টেশনে ট্রেনে তুলতে আসত একজন যাত্রীর জন্য একাধিক পরিচিত ও পরিজন। অবলা প্রাণীকে আঘাত করার মতো বিকৃত মানসিকতা তৈরি হয়নি তখন। এণাক্ষী যেমন অসুস্থ বা পথ হারানো শিশু সারমেয়-মার্জার নজরে পড়লে তৎক্ষণাৎ বাড়িতে এনে আশ্রয় দিতেন। তেমনই আছে বিড়াল দধিমুখীর কথা।

কোনো জেলা বা শহরে বিখ্যাত কোনো কোনো দোকান ঐতিহ্য বহন করে। এণাক্ষীর স্মৃতিলিখনে তেমনি উঠে এসেছে জলপাইগুড়ি বেলাকোবার 'পোড়াবাড়ির চমচম', বাহ্যিক ভাঙাচোরা অথচ সুবিখ্যাত ঢাকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের 'কালাকাঁদ', সোসাইটির 'চপ-কাটলেট', রূপশ্রী হলের বিপরীতের 'গন্ধেশ্বরীর মিষ্টি', 'কবিরাজ যজ্ঞেশ্বরের দোকানের' বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম ও স্মৃতি। সারা শহরে প্রসিদ্ধ ছিল তখন 'দাদুর ভাজা' নামক চানাচুরওয়ালার বিশেষ সাজ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো চেহারা দেখে দেশ-কাল আর শৈশবের সহজ বুদ্ধি মিশে যেত অনায়াসে। এণাক্ষী রায়ের ভাষায় —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ঝুমঝুম শব্দ করে হেঁটে হেঁটে আসতেন দাদু। হাতে ধরা সাইকেলের সঙ্গে আটকানো টিনের বড় কৌটো। তার ওপর বাংলায় লেখা 'দাদুর ভাজা'। ...দাদুর পরনে থাকত সার্টিনের গেরুয়া পাজামা আর শার্ট। ওই কাপড়েরই নেতাজীটুপি। কায়দা করে একটু ত্যারছা করে পরা। কোমরে বন্ধনী। ফর্সা ধবধবে দাদুকে দেখতে ছিল অবিকল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ...আমরা জানতাম নেতাজির অন্তর্ধানের খবর। আমরা এও জানতাম নেতাজিই ছদ্মবেশ ধারণ করে দাদুর ভাজা বিক্রি করছে। চারদিকে যখন নেতাজি ফিরে আসবে ফিরে আসবে রব, আমরা নিশ্চিত নেতাজিকে আমরা চিনি, আর এত বুদ্ধিমান বড়রা কিছু বুঝতে পারেন না।"[১৫]

ছোটবেলায় এমন কত কল্পনাকে সত্যি ভেবে অপার আনন্দ জাগত মানুষের মনে। প্রাপ্তবয়সে এসে সেগুলি এখন আমোদের রসদ। তেমনই কদমতলার মোড়ে রোজ বিকালে জমায়েত হওয়া কাবুলিওয়ালাদের দেখে 'মিনির গল্প' মনে পড়ত এণাক্ষীর। কিন্তু 'কী, খোকি?' বলে কেউ ডাকত না। হাসত শুধু তারা ছোট মেয়ের অবাক চাহনি দেখে।

জলপাইগুড়ি শহরের চরিত্রই ছিল আত্মীয়ের মতো। তাই ১৯৬৮ ও তার আগে ১৯৫০ এর বন্যার ভয়াবহতা জেনেও জলশহরের প্রতি শহরবাসীর ছিল অমোঘ টান। তাই তিস্তা-ধরলা-রুকরুকা নিয়ে জলপাইগুড়ি এণাক্ষী রায়ের জীবনেও আশ্রয়দাত্রীস্বরূপা।

শিকড়ের সন্ধানে মন অবিচল :

> "রক্তের ভেতরে সেঁধিয়ে যাওয়া এ প্রকৃতি এই শহরের কুয়াশা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, শিশির, মাটি সব মিশে যায়। একাকার এক সত্তা। এর থেকে উপড়ে নিলে আমার আর কোনও জীবনই নেই। কোনওদিন এ মাটি থেকে তাকে উপড়ে নিলে রুকরুকার মতো শুকিয়ে যাব আমি।"[১৬]

এই শিকড় উপড়ে প্রাণহীন হওয়ার আশঙ্কা সত্যি হল একদিন এণাক্ষী রায়ের জীবনে। সেই সময়ে স্বেচ্ছায় কলকাতায় যেতে চেয়েছিলেন তিনি, সেই সময় বাবা-মা সঙ্গে নেননি। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর যেই সময়ে শিকড়ের টানে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন জলপাইগুড়ি শহরটাকে, সেই সময় তাকে ছিন্ন হতে বাধ্য করা হল। পরিবার-পরিজন ছাড়াও যাদের জন্য তৈরি হল মনখারাপের দীর্ঘ তালিকা, তা থেকে তাঁর প্রবল সংবেদনশীল মননের ঠিকানার আভাস মেলে। যেমন - ঠাকুমা, বড়মা ছাড়াও তাঁর মনখারাপ প্রতিদিন খেলা-ফেরত হাত-পা ধোওয়া জলের কলটার জন্য, দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠটার জন্যে, টবের মধ্যে চোখের সামনে বেড়ে ওঠা জামরুল গাছটার জন্য, কুয়োর জলের জন্য, কাঠালগাছের পাতায় পাতায় বিচ্ছেদের বিষন্নতা অনুভব করেন। বিষন্নতা অনুভব করেন সাদা গোলাপ গাছের চেহারায়। বহু মাইল দূরে পড়ে থাকবে করলা-ধরলা-রুকরুকা। বসন্ত এসে কড়া নেড়েছিল মনের দরজায়। এক জোড়া চোখ অপেক্ষায় থাকবে কথা দিয়েছিল তিস্তার বাঁধে। প্রথম বা শেষ কোনোবারের সাক্ষাৎই হওয়ার সুযোগ হল না। শহর-ভালোলাগা-ভালোবাসা-প্রেম সব অতীতের স্মৃতি হয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করবে মনের গভীরে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন বড় হয়ে আবারও ফিরে আসবেন জলপাইগুড়িতে, শিকড়ের টানে। যে নদীগুলি পড়ে থাকবে, পড়ে থাকবে সবুজ গালিচা, রেললাইনে ঝরে পড়া পুটুশ ফুলগুলি, মাথার উপর মশার ঝাঁকের পরিচিত শব্দ আর চারিপাশে চেনা মুখের ভিড়—সব ছেড়ে চলে যাওয়াকে এণাক্ষী রায়ের মনে হয়েছে মায়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে সন্তানকে কেড়ে নেওয়ার মত বেদনাতুর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওপার বাংলা থেকে যখন দেশভাগের সময় এপার বাংলায় দশ বছরের অতীত শৈশব ফেলে এসেছিলেন সুনন্দা সিকদার, তাঁরও ছিল ওপারের দিঘপাইতের প্রতি গভীর আবেগাশ্রু। কলম ধরেছিলেন ছিন্নমূল শিকড়ের সন্ধানে —

> "যাঁরা মনের গতিবিধি নিয়ে কাজ করেন, তাঁরাই বলতে পারবেন, আমি কেন শৈশবের দশটা বছর এমন যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছি এত কাল।"[১৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুনন্দা সিকদারও ওপারে ফেলে আসা নদীগুলিকে স্বপ্নে চাক্ষুষ করেন। ঠিক যেমন এণাক্ষীও অনুভব করেন। 'দয়াময়ীর কথা' স্মৃতিলিখনে সুনন্দা সিকদার —

> "স্বপ্নে দেখি ছিড়াজাঙ্গাইল পুল শুয়ে আছে ঝিনই নদীর উপর। বড় খেয়ালি ঝিনই নদী; কখনও শান্ত, কখনও অতি দুরন্ত।[১৮]

অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'র লেখক দেবেশ রায়, সাহিত্যের আনাচে-কানাচে যাঁর উত্তরবঙ্গ, তিনিও প্রথম জীবনে ছিলেন জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ির পাহাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা প্রসঙ্গে এণাক্ষী রায় উল্লেখ করেছেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের কথা। দেবেশ রায়েরও জীবনের প্রথম পাঠগ্রহণ ছিল পাহাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি যখন জলপাইগুড়ির শিকড় ছিঁড়ে কলকাতায় পাড়ি দিলেন, তখন বিচ্ছিন্নতা তাঁকে বিষন্ন না করার কারণ উল্লেখ করেছেন —

> "...জলপাইগুড়িতে তো আমাদের বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন; বন্ধুবান্ধব সবাই থেকে গেলেন। আমার পক্ষে সাবেকি বাঙালির সেই কলকাতা আর 'দেশের বাড়ি'র ঘটনাটাই সত্য হয়ে উঠল।"[১৯]

কিন্তু এণাক্ষী রায়ের জীবনে ছিল প্রত্যহ যাপনের সঙ্গে জড়িত জলপাইগুড়ির গভীরকথা। অমোঘ আকর্ষণ ছিল তাঁর জন্মশহরের প্রতি। তাই দেশের বাড়ি হিসাবে শুধু আনুষ্ঠানিক সাক্ষাত প্রাণোচ্ছল দিনযাপনের বিকল্প হয়ে উঠবে না কখনই।

> "ট্রেনের গতি তীব্র হতে দেখলাম দূরে সরে যাচ্ছে আমার শহরের প্রান্ত। আমার সমস্ত শৈশব, কৈশোর, দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট, কিতকিত খেলার ঘুঁটি, এক্কাদোক্কার ঘরকেনা, তিস্তা বাঁধের কদম, কিংসাহেবের ঘাট। ...মনখারাপের কথাগুলো বোঝে না পৃথিবী। হয়তো পৃথিবীরই এত বিষাদ যে সে আর শুনতে চায় না এসব কথা। মনখারাপের কথা চোখের জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে এগোই। কলকাতার বিষাক্ত ধুলোবালির দিকে, ধোঁয়াময় বাতাসের দিকে, অস্পষ্ট আকাশের দিকে, আমার এই একাকী যাত্রা...।"[২০]

শৈশব, শহর, সময়-কাল-ইতিহাস আর ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে এণাক্ষী রায় জন্ম দিলেন স্মৃতিলিখন 'জলের ভুবনে'র। যে জলের ভুবনের শিশু ও কিশোরী এণাক্ষী চাইতেন করলার স্রোতে ছুটে চলা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া কচুরিপানাকে জিতিয়ে দিতে। ঝিঁঝির একটানা ডাক যাঁর কাছে একঘেয়ে নয়, বরং মোহাবিষ্টের মতো অনুভূত হত, পাখির বৈচিত্র্যপূর্ণ ডাকে যাঁর চমক লাগত, প্রজাপতি-পিঁপড়ে-ফড়িং নিরীক্ষণ ছিল যাঁর খেলা, সেই মানুষটিকে কংক্রিটের জঙ্গলে এনে রোপণ করার চেষ্টা মানসিক অপমৃত্যুর সমতুল্য। তাই মনের মধ্যে গড়ে তোলেন জলের ভুবনের বলয়। সেই বলয়ে সুরক্ষিত রাখেন স্মৃতির কাঞ্চনজঙ্ঘা। সযত্নে লালন করেন স্মৃতি, ধুলো জমতে দেননা, নগরকেন্দ্রিক জীবনচর্যা গ্রাস করতে পারেনা জলশহরের ছবি। লেখিকার ব্যক্তিজীবনে রূপকথার স্বপ্ন দিয়ে সুরক্ষিত ফেলে আসা শৈশব আর শহর। কলমের আঁচড়ে যেন শুধু লিখে যাওয়া নয়, বড় ক্যানভাসে মুহূর্তে এঁকে ফেললেন আস্ত এক অন্য পৃথিবী। শৈলীবিচারে শব্দের বুননে আছে কাব্যিকতার স্পর্শ। শব্দগুলো যেন অনাবিল আনন্দে রূপকথার রঙিন মাছেদের মতো বিচরণ করছে এই স্মৃতিলিখনের ভুবনে। এণাক্ষী রায়ের ভাসানো সেই কাগজের নৌকা তরতরিয়ে বয়ে চলেছে স্মৃতির পসরা সাজিয়ে এই 'জলের ভুবনে'।

Reference:

১. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৭৬
২. তদেব, পৃ. ১৪
৩. তদেব, পৃ. ২৭
৪. তদেব, পৃ. ৩৩

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 353 - 364
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. তদেব, পৃ. ৩৯
৬. তদেব, পৃ. ১০৯
৭. তদেব, পৃ. ৮৯
৮. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (সম্পা.), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স (প্রকাশন বিভাগ), কলকাতা, মার্চ ২০১২, পৃ. ৩২৭
৯. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১০৮-১০৯
১০. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৩৯
১১. তদেব, পৃ. ১৪২
১২. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২
১৩. তদেব, পৃ. ৩৫
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৯
১৫. তদেব, পৃ. ৫৭ - ৫৮
১৬. তদেব, পৃ. ১২৭
১৭. সিকদার, সুনন্দা, দয়াময়ীর কথা, একাদশ প্রকাশ, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৪২
১৮. তদেব, পৃ. ৪৪
১৯. রায়, দেবেশ, গল্পসমগ্র ৪ (ভূমিকা), প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ৯
২০. রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২

Bibliography:

আকরগ্রন্থ :

রায়, এণাক্ষী, জলের ভুবন, প্রথম সংস্করণ, রাবণ, কলকাতা, ২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ :

চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (সম্পা.), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স (প্রকাশন বিভাগ), কলকাতা, মার্চ ২০১২

বিশ্বাস, অচিন্ত্য, লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

রায়, দেবেশ, গল্পসমগ্র ৪, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৪

সিকদার, সুনন্দা, দয়াময়ীর কথা, একাদশ প্রকাশ, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২